প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

callprasun@gmail.com

মুখোশ

অলংকরণ শান্তনু দে

‘হাই রণদীপ কেমন আছ? অনেক দিন পর দেখলাম, গুড টু সি ইউ ইন শেপ, ম্যান!’

সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ‘মুখোশ’ ছবির মহরতে এ ধরনের দুয়েকটা প্রোবিং প্রশ্নের মুখে যে পড়তে হবে, জানত রণদীপ। বেসিক্যালি পার্টি অ্যানিম্যাল সে। মাঝে কিছুদিন এই পেজ থ্রি পার্টিগুলো মিস করেছে— তাও অন্তত ছ’মাস। যে লোক কলকাতার পেজ থ্রি পার্টি মিস-ই করত না, তার জন্য ছ’মাসের সময়সীমা খুবই বড়। প্রশ্নগুলো তাই প্রত্যাশিত ছিলই।

প্রশ্নকর্তা আব্বাস হোসেন— ইন্ডাস্ট্রি যাকে এককথায় ‘আব্বাস ভাই’ বলে চেনে। গত ছ’টা ছবি হিট, একটা আবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। আব্বাস এই মুহূর্তে হ্যাপেনিং।

রণদীপ হাসল। ‘আব্বাস সাহেব, আপনার মতো কপাল আর পেলাম কোথায়? করে খেতে হয়, তাই মাঝে মাঝে হয়ে ওঠে না। এনিওয়ে, দিল্লি গিয়েছিলাম কয়েকবার; বাকি সময়টা এখানেই ছিলাম, কিন্তু অনেকগুলো সমস্যা সামলাতে সামলাতে কয়েক মাস কোথাও সেরকম যাওয়া হয়ে ওঠেনি আর।’

রণদীপ বসু। ফর্টিসেভেন, মুম্বই জে জে স্কুল অফ আর্টস, তারপর টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস। সোশ্যাল সেক্টরে অসম্ভব সফল, ফোর্ড ফাউন্ডেশনেও কাজ করেছে কয়েক বছর। তারপর বারাসতের কাছে পৈতৃক জমিতে একটা অনাথ বাচ্চাদের হোম খোলা, পুরনো কনট্যাক্টগুলো কাজে লাগিয়ে দ্রুত বেড়ে ওঠা রণদীপের ইউএসপি।

এই হোমগুলো আজকাল বেশ চলছে। আপনার যদি একটু প্রশাসনের দরজায় অবাধ গতিবিধি থাকে আর সোশ্যাল সেক্টরে কাজ করার প্যাশন থাকে— এটা হতেই পারে আপনার জন্য দারুণ এক কেরিয়ার অপশন। এই কথাটা অনেককেই বলে রণদীপ। নিজের জীবনে একটা অসম্ভব সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছে তার। গত দশ বছরে আকারে-গুরুত্বে তরতর করে বেড়ে উঠেছে ওর হোম।

নবাগতা তৃষা দাশগুপ্তর ছিপছিপে কোমরটা জড়িয়ে নাচ করেছেন কলকাতার নামকরা আর্কিটেক্ট ভুবন মিটার। রসিকতা করে লোকে বলে, মিত্তিরের মিটার হয়ে ওঠাটা ভীষণ সিগনিফিক্যান্ট— ওর ডিজাইন করা প্রায় ডজনখানেক লাইফস্টাইল কমপ্লেক্স যেভাবে মিটার বাড়িয়েছে স্কোয়ার ফুটের, তা কলকাতার রিয়্যাল এস্টেট বিজনেসে একেবারে অভূতপূর্ব!

বিকাশ চুড়িওয়ালার পয়সা আর ভুবন মিটারের স্থাপত্য— এই কম্বিনেশনটা মোটামুটি সুপারহিট। বিকাশের সাংঘাতিক ভাল পিআরটাও কাজে দেয় দুনিয়ার এনওসি সহজেই আদায় করতে। ভীষণ স্মুথ অপারেটর এই বিকাশ-ভূষণ জুটি। ‘বি-ভূ’ এখন ট্রেন্ডিং। তৃষা সম্পর্কে শুনেছে রণদীপ। মেয়েটা একেবারে চড়চড় করে উঠেছে ইন্ডাস্ট্রিতে। পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চি উচ্চতা, তার সঙ্গে স্টিলেটো সংযোজন করে একেবারে স্ট্যান্ড আউট বিউটি। বি-ভূ জুটি সম্ভবত প্রোডাকশনসে আসতে চলেছে। তৃষার কোমরে কখনও ভুল হাত পড়েনি। ইনসাইড স্টোরিটা জানতে হবে, জ্যাক ডানিয়েল্‌সের প্রথম পেগে বরফের খণ্ডগুলোকে বিরক্ত করতে করতে ভাবছিল রণদীপ।

‘আলাপ করিয়ে দিই, ডা. লাভলি রায় অ্যান্ড দিস ইজ রণদীপ বসু।’ আব্বাস সাহেবের গলাই বলে দিচ্ছে, ‘মুখোশ’ নিয়ে কতটা আশাবাদী তিনি।

রণদীপ ঘুরল, ব্ল্যাক শিফন, হল্টার নেকে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের একজন পরিপূর্ণ নারীর মুখোমুখি হতে। ডা. লাভলি রায়— যাকে বলে ‘ফুল অ্যান্ড বিউটিফুল’।

ভদ্রমহিলা শিশু চিকিৎসক। কলকাতার তিন-চারটে নাম করা হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। ভিজিটিং কার্ডটা দেওয়ার সময় নিজের ব্যক্তিগত মোবাইল নাম্বারটা হাতে লিখে দিলেন ডা. লাভলি রায়।

Sheaffer। ঠাহর করতে ভুল করেনি রণদীপ। অনেক দিন আগে ওর বান্ধবী ডা. রাশি রায় একবার গিফ্‌ট করেছিল। এই আমেরিকান কলমটা ওকে প্রথম চেনান ওর মা, ওর মুম্বই যাওয়ার আগে। সিটি সেন্টারের ক্রসওয়ার্ড থেকে কিনে ওকে গিফ্‌ট করেছিলেন ওর মা, যিনি রণদীপের দেখা সবচেয়ে কমপ্যাক্ট উওম্যান। উচ্চশিক্ষিত নন, কিন্তু সাংঘাতিক ওয়েল ইনফর্মড। একা উইম্বলডন দেখেন, এমন মহিলা কমই আছেন। ওর মা এক্সেপশনাল।

একটা রাশির দেওয়া, আরেকটা মায়ের দেওয়া দুটো Sheaffer-এর মালিক রণদীপ।

ডা. মিসেস রায় পার্টিতে অনায়াস। হল্টার নেক, ব্ল্যাক শিফন, দুধসাদা পিঠ, নরম গোল হাত, এয়ারহস্টেস নট— রণদীপের সব ফ্যান্টাসির কোলাজ— লাভলি।

পরের দিন রোববার। সারা সপ্তাহ কাজের পরে এই একটা দিন ল্যাদ খাওয়ার একটা অধিকারবোধ কাজ করে রণদীপের। এগারোটায় ঘুম থেকে উঠল সে। কার্ডটা কোথায় রাখল যেন?

আজকাল দুম করে ফোন করাটা অসভ্যতা আর কাউন্টার প্রোডাক্টিভ। হোয়াটসঅ্যাপের যুগে একটা সুভদ্র অর্থবহ বাক্য বা ছবি অনেক বেশি ফলপ্রসূ প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া পাওয়ার ব্যাপারে। তারপর দেখেশুনে ফোন করা, ইদানীং এটাই দূরভাষ-এটিকেট।

জবাব এল সন্ধের পরে।

‘ফোন করতে পারেন রণদীপ?’

সংক্ষিপ্ত অথচ অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী বার্তা।

কাজের পরিধির নিরিখে বেশ কাছাকাছিই দু’জনে। রণদীপ তাই আমন্ত্রণ জানাতে ভুলল না, ‘একদিন আসুন আমার হোমে। আপনি তো বাচ্চাদের ভালবাসেন, ভাল লাগবে আপনার।’

ডা. লাভলি রায় আর রণদীপের পার্টনারশিপের সেই শুরু। বাচ্চাদের ছোটখাট শারীরিক সমস্যায় আজকাল অনেক কুল থাকে রণদীপ— লাভলি সামলে নেবে। হোমের বাচ্চারাও বেশ পছন্দ করতে শুরু করল এই মধ্য চল্লিশের সুন্দরীকে। একটা অসম্ভব আকর্ষণ করার ক্ষমতা ছিল ওর মধ্যে। মাঝে মাঝে রণদীপও বিস্মিত হত ওর জনপ্রিয়তার গ্রাফ দেখে। একেবারে এল, দেখল আর জয় করল।

আকর্ষণটা যে ফেটাল্, সেটা অনেক পরে বুঝেছিল রণদীপ, কিন্তু বড্ড দেরি করে ফেলেছিল।

ছয় বছরের ওসমানের মৃত্যুর সময়েও এরকম কিছু মাথায় আসেনি রণদীপের। সামান্য ক’দিনের জ্বরে মারা গিয়েছিল ওসমান। প্রথম থেকেই লাভলি দেখছিল। হঠাৎ যে অবস্থা এতটা খারাপ হয়ে যাবে, কেউই সম্ভবত বুঝতে পারেনি। রণদীপ খুব ভালবাসত ওসমানকে। এই প্রথম রণদীপের হোমে এমনটা হল।

দ্বিতীয়টা একমাস পরে। এবার শ্রবণা। বয়স তেরো।

একমাসের ব্যবধানে দুটো মৃত্যু নাড়িয়ে দিয়েছিল রণদীপকে। কেন এমন হচ্ছে? সবটাই দুর্ভাগ্য? কোথাও কি খটকা আছে? খটকা একটা ছিল। কিন্তু ছবিটা স্পষ্ট হচ্ছিল না। অস্বস্তি বাড়াল আরেকটা ঘটনা।

একটা এসএমএস এল রণদীপের মোবাইলে। প্রেরক নিজের নাম লিখেছেন অনির্বাণ রায়। কথা বলতে চেয়েছেন। সাধারণত এই ধরনের এসএমএস অগ্রাহ্য করে রণদীপ। ধান্দাবাজ প্রেসের কাছ থেকে এই ধরনের টেক্সট পেতে পেতে অভ্যস্ত ও। নিজের গুরুত্ব বোঝাতে প্রথমে একটা এসএমএস, তারপর একটু আশঙ্কার কথা শোনানো, তারপর এক্সটর্সন। ‘জানেন তো, একটা নেগেটিভ রিপোর্ট করার ইন্সট্রাকশন আছে আপনার হোমের ব্যাপারে; দেখুন কী করবেন।’ মোটামুটি কুড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকায় রফা। নগেন্দ্র স্মৃতি স্কুলে পড়া ফেল করা ছেলেটাও এখন সাংবাদিক। ব্যারাকপুরে একটা কথা খুব চলত— যার নাই কোনও গতি, তার আছে নগেন্দ্র স্মৃতি।

রফা হল দুটো ব্ল্যাক লেবেল আর পঁচিশ হাজারে। এটা একটা বড় গুণ অনেক সাংবাদিকের, মদ কিনে খায় না। পার্টিতে গেলে ফোকটে, আর রেস্তোরাঁয় বিল পেমেন্টের দায় যে ডেকেছে, তার। ওরা আজন্ম পরজীবী। দ্য সাকিং প্যারাসাইটস।

মিডিয়া ম্যানেজড হওয়ার পর ইমিডিয়েট টেনশনটা গেল। যেটা গেল না, সেটা খুঁতখুঁতানি। পরপর মৃত্যুগুলো কি নেহাতই দুর্ভাগ্য, না কি এর পিছনে অন্য কিছু আছে?

অন্য কিছু যে আছে এবং সেটা যে এত ভয়ংকর, তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি রণদীপ!

মন ভাল না থাকলে কয়েকটা জিনিস করতেই থাকে রণদীপ। ওর মন ভাল করার টোটকা— শোভা দে-র ‘Shethji’-টা আরেকবার পড়ল। শোভা দে-র একমাত্র পলিটিক্যাল পটপৌরি। উত্তর ভারতে পটভূমিকায় এই পাওয়ার পলিটিক্স, তার সঙ্গে টিপিক্যাল ‘দে’ ফ্লেভারটা রণদীপের খুব প্রিয়। শোভা দে-র সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপও আছে রণদীপের। রণদীপের এক বউদি, সোহিনী, একটি প্রথম শ্রেণির দৈনিকের পুণে দফতরের সাব এডিটর। সোহিনী বউদিই দিয়েছিল শোভা দের নাম্বার। ফোনে কথাও হয়েছে কয়েকবার। ইন্টারেস্টিং মহিলা। খুব ভাল বাংলা বলেন। রণদীপ ওঁর সব বই পড়েছে শুনে এত খুশি হয়েছিলেন! যে কোনও ক্রিয়েটর-ই তাঁর সৃষ্টি নিয়ে খুব সেনসিটিভ হন, শোভা দেও তার ব্যতিক্রম নন।

রণদীপের আরেকটা প্রিয় স্ট্রেস বাস্টার হচ্ছে তার পছন্দের দুটো গান— এড শিরানের ‘Shape of You’ আর কেনি রজার্সের ‘Love The Way You Do’।

তিন-চারদিন পরে রণদীপ ডিসাইড করল, লাভলিকে একান্তে মিট করবে।

বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়নি। ফোন করে আসাটাই ভদ্রতা ছিল, কিন্তু ফর্মালিটিজ করার মেজাজেই ছিল না সে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল পুশ করল। কৃষ্ণাঙ্গী, বছর চল্লিশের এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দাঁড়ালেন।

—কাকে চাই?

—ডা. লাভলি রায় আছেন?

—আপনি?

—বলুন রণদীপ এসেছে।

পারমিশন মিলল। ‘বসুন, দিদিমণি স্নানে গেছেন।’

সাদা কটন বাথরোব পরে, চুলে তোয়ালে চালাতে চালাতে লাভলির এন্ট্রি।

—হোয়াট আর প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ! বাড়ি খুঁজে পেলে? ফোন করলে না কেন?

মোটামুটি মিনিট পাঁচেকের র‍্যাপিড ফায়ারের পরে দম নিল রণদীপ। গুছিয়ে মিথ্যা বলার জন্যও একটা মাইন্ডসেট লাগে। এ তো মোটামুটি গেস্টাপো ইন্টারোগেশন!

‘Inside The Third Reach’ বইটা বাঁদিকের বুক শেলফে দেখেই সম্ভবত গেস্টাপো কথাটা মাথায় আসে রণদীপের। দ্য জার্মান সিক্রেট পোলিশ অফ হিটলার।

‘ইন্টারেস্টেড ইন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার?’

রণদীপের প্রশ্ন। বুক শেলফে উঁকি মারা ‘Main Kampf’ তো হিটলারের রাজনৈতিক মতাদর্শের নিজের লেখা দলিল, পরিভাষায় যাকে বলে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল ম্যানিফেস্টো।

মাথার চুল মুছতে গেলে হাত দুটো উপরে তুলতে হয়। একটা স্বস্তিকা চিহ্নের মতো লকেট সোনার চেন থেকে ঝুলছে, বিভাজিকাকে আরও সমৃদ্ধ করে।

হালকা জলের ঝাপটা বিন্দু বিন্দু কামনার মতো রণদীপের মুখে ছুড়ে দিতে দিতে লাভলি অনায়াস। ‘নো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে আমার কোনও বিশেষ উৎসাহ নেই। কিন্তু, নাৎসিদের সমন্ধে আছে।’

রণদীপের আজ এখানে আসার কারণ অবশ্যই লাভলিকে আরেকটু ভালভাবে জানা। অফিস আর পার্টির মধ্যে আলাপচারিতাগুলোও কেমন যেন প্রত্যাশিত হয়ে যায়। রণদীপ আজ একটু জানতে চায় লাভলিকে। নাৎসিপ্রেম সেই জানার প্রথম পর্ব।

‘ইন্টারেস্টিং!’

এতদিন কমিউনিস্ট ভাবধারার লোকেদের দেখে দেখে অন্য কোনও ইজম বা মতবাদ সম্পর্কে কেউ এত সিরিয়াস— এই ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে কয়েক মিনিট সময় লাগল তার। ওর নিজের অবশ্য ফ্যাসিজম আর নাৎসিজম নিয়ে ধারণা শার্লক হোমসের ভাষায় ‘এলিমেন্টারি’। নাৎসি জার্মানি নিয়ে রণদীপের জ্ঞান উচ্চমাধ্যমিক স্তরে, প্রভাতাংশু মাইতিতেই আটকে আছে।

‘হুমম। এটা মার্কসিজমের থেকেও শক্তিশালী মতবাদ ছিল। জার্মানরা নর্মান্ডি ল্যান্ডিংটা আটকাতে পারলে হনোলুলু থেকে হালিসহর পর্যন্ত হিটলারই রাজ করতেন।’ লাভলি চা ঢালতে ঢালতে বলল। দুটো স্বর্ণকলসের সাম্রাজ্যে নিরন্তর হাতছানি, ঝুঁকে পড়ায় বেরিয়ে আসা লকেট স্পষ্টতই স্বস্তিকা চিহ্ন। রণদীপের চোখ সাম্রাজ্যে, স্বস্তিকায় নয়।

‘এই জায়গাটায় আমি একটু উইক। এই থিওরিটিক্যাল ফাউন্ডেশনগুলো কখনও নেড়েচেড়ে দেখা হয়নি।’ রণদীপের হাত লাভলির আঙুল ছুঁয়ে গেল। ‘চায়ে পে চর্চা’ কত যে ‘মন কি বাত’ তৈরি করে!

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রণদীপ। ‘তোমার কালেকশনটা একটু দেখতে পারি?’

লাভলি জানে যে, পুরুষ মানুষ যতই ইন্টেলেকচুয়াল হওয়ার চেষ্টা করুক, তাকে মোটামুটি গুলিয়ে দেওয়ার জন্য নারীর বেশিক্ষণ লাগে না। সরু কোমর, ভারী বুক আর গুরু নিতম্বের লাভলি রায়কে ছেড়ে কতক্ষণ আর আঁতলামি করে বই দেখবে? এরকম কত বুদ্ধিজীবী শ্রম দিয়েছেন এ ঘরে!

‘দেখো না!’ লাভলি আশকারা দিচ্ছে সব দেখার।

বুক শেলফটা বেশ গোছানো। বইগুলো বিষয়ভিত্তিক সাজানো। ঐতিহাসিক, মোটিভেশনাল, ক্লিনিক্যাল পেডিয়াট্রিক ইত্যাদি। কিছু চয়েস রণদীপের সঙ্গে মেলে। শোভা দের ‘Starry Night’ আর খুশবন্ত সিংয়ের ‘Company Of A Woman’ ওরও খুব প্রিয়। অসম্ভব গতিসম্পন্ন লেখা দুটোই। লেখাটা চলবে না, দৌড়বে— পাঠককে বাধ্য করবে পাতা ওলটাতে এটা ফিকশনের একটা চাহিদা। অনেক ভাল লেখক আছেন, যাঁদের কনটেন্ট খুব সমৃদ্ধ, কিন্তু লেখাটা... ওই যাকে বলে ‘পেজ টার্নার’ নয়, যেটা ফ্রেডেরিক ফরসাইথের সাফল্যের মূল ইউএসপি। এই ধরনের ন্যারেটিভ খুবই রেসি, যা লেখাকে কোনওভাবেই শ্লথ করে না।

পেন্টহাউসের প্রায় ছ’-সাতটা কালেকশন আছে। খুব জনপ্রিয় সেক্স ফ্যান্টাসি। রণদীপও পড়ত একসময়ে। লাভলি রায় ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছেন। ইতিহাসের তাকটাও বেশ সমৃদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা বেশ কয়েকটা বিখ্যাত বইয়ের সম্ভার। রণদীপের এক বান্ধবী আছে, শর্মিষ্ঠা। একটা কলেজে ইতিহাস পড়ায়, তার চেয়েও বড় কথা ইতিহাসটা প্রাঞ্জলভাবে বোঝায়। রণদীপের যাবতীয় ইতিহাস জ্ঞানের উৎস। শর্মিষ্ঠা একদিন বলেছিল, ১৮৬০-১৯৫০ এই সময়টা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভাইব্র্যান্ট সময়। এত প্রতিভা একসঙ্গে এর আগে বা পরে কখনওই জন্মায়নি। রবীন্দ্রনাথ থেকে লেনিন, বিবেকানন্দ থেকে গোয়েবল্‌স, চার্চিল থেকে হিটলার, নেহরু থেকে গ্রেটা গার্বো— গ্রেটদের এত ঠাসাঠাসি ভিড় কখনও হয়নি। চার্চিলের ‘Great Contemporaries’ বইটা ছিল একদম ডানদিকে। পাশে চার-পাঁচটা বই ছিল ডা. জোসেপ গোয়েবল্‌সের উপর। এত বড় গোয়েবল্‌স ভক্ত কমই দেখেছে রণদীপ। লাভলি রায়কে পুরোপুরি উন্মোচিত করা বেশ সময়সাপেক্ষ।

ডা. জোসেপ গোয়েবল্‌স। বিশ্ব ইতিহাসের এক অন্যতম আন্ডাররেটেড দার্শনিক। বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, তারপর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে ডক্টরেট। নাৎসিজমের থিওরিটিক্যাল বেস-টা অনেকটাই গোয়েবল্‌সের তৈরি। খুব পাওয়ারফুল ওরেটর ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানিতে বেকারত্ব, হতাশা, খিদে সবই পূর্ণমাত্রায় মজুত ছিল। সময়টা ১৯১৮। ইউরোপে তখন বলশেভিক বিপ্লবের ঝড় চলছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে ঘটে যাওয়া এই কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়তেই পারত জার্মানিতে। সব মশলাই তো মজুত। বেকারত্ব, হতাশা, যন্ত্রণা— যা ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিনকে একটা রেডি ম্যাট্রিক্স দিয়েছিল, তা একেবারে পুরোমাত্রায় মজুত ছিল জার্মানিতে। চার্লি চ্যাপলিনের সেই বিখ্যাত ‘The Great Dictator’ সিনেমায় চ্যাপলিন নিজের ভাষায় এই অবস্থাটা দারুণ ধরেছেন। বড় প্রিয় ছবি এটা রণদীপের। শর্মিষ্ঠা বলেছিল, কমিউনিজম যে সেই সময়ে সে অর্থে জার্মানিতে সফল হল না, তার একটা বড় কারণ একটা পাওয়ারফুল কনভিন্সিং কাউন্টার থিওরি। জার্মান মানুষকে গোয়েবল্‌স কোথাও যেন বোঝাতে পেরেছিলেন যে, এই অবস্থার একটা অন্য ব্যাখ্যা আছে, অন্য সমাধান আছে। আর সেই চিন্তার আঁতুড় ছিল হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিহাস বই দেখলেই কেন যে ওর শর্মিষ্ঠার লেকচার মনে পড়ে!

বুক শেল্‌ফের পাশে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা শর্ট টার্ম সামার কোর্সের সার্টিফিকেটই গোয়েবল্‌স সম্পর্কে লাভলির উৎসাহের প্রমাণ ব্যাখ্যা করছে।

‘Main Kampf’-এর পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে রণদীপ অনুভব করল, ওর পিছনে লাভলি। পিছন থেকে রণদীপকে আলতো করে জরিয়ে ধরল। চুলের গন্ধ আহ্‌, অরিজিনাল Wella! পারফিউমটার নাম জানে না রণদীপ। হাইডেলবার্গ এখন অস্পষ্ট, রণদীপ চলল লাভলি রায়ের নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীরশিক্ষার পাঠ নিতে। অনেকদিন পরে আবিষ্কারের আনন্দে মাতল রণদীপ। ভরা নদীতে সাঁতার, সোফিয়া লরেন আর ‘দুর্গেশনন্দিনী’-র বিমলার কম্বিনেশন ডা. লাভলি রায় যেন প্রাচ্যের রহস্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের উদ্দামতার কোলাজ!

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে মুহূর্তগুলোকে রিওয়াইন্ড করছিল রণদীপ। লাভলির সাম্রাজ্যে আবার বিচরণ করতে চাইছে মন। ভারী উরু, সরু কটিদেশে, গুরুবক্ষা, রমণে অক্লান্ত এই রমণী।

ভালই কাটছিল দিনগুলো। দিন পনেরো পরে দৈনিকটা হাতে না আসলেই ভাল হত।

তারই বিনোদন বিভাগের পাতাটায় চোখ বুলিয়ে মূল কাগজটা পড়া ওর চিরকালীন অভ্যাস। কাগজ শেষ পাতা থেকে পড়ার একটা অদ্ভুত অভ্যাস আছে রণদীপের। খুব ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে আইফোনের নোট অ্যাপে স্ক্যান করে সেভ করে। সেখানেও ফোল্ডার করা আছে— যেমন স্পোর্টস, পলিটিক্স, সিনেমা ইত্যাদি। বরাবরই ভীষণ অর্গানাইজ্‌ড সে।

চায়ে হালকা চুমুক দিয়ে কাগজের মাঝামাঝি অংশে এসে একটা খবরে চোখ আটকে গেল। ডেভিড চার্টার বলে এক ভদ্রলোক একটা ইন্টারেস্টিং আর্টিক্‌ল লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, ‘Hans Asperger, the Austrian paediatrician whose name describes a form of Autism, actively assisted in the murder of disabled children by the Nazis, according to two sets of new research’। ডেভিড চার্টার বলেছেন যে, হারউইগ চেক (Herwig Czech) নামক একজন মেডিকেল গবেষক লিখেছেন যে, আসপার্গার এতটাই নাৎসি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন যে, তিনি ইউথানাশিয়া করে বাচ্চাদের মেরে ফেলতেন! পুরো কাজটাই গোপনে সংগঠিত হত ভিয়েনার আম স্পিগেলগ্রুন্ড (Am Spiegelgrund) ক্লিনিকে। ১৯৮০ সালে ডা. আসপার্গার মারা যান। অসাধারণ খ্যাতিসম্পন্ন এই চিকিৎসকের এই ভয়ংকর দিকটি নাকি একটি বইতে বিবৃত আছে; এডিথ শেফারের লেখা “Asperger’s Children: The Origins of Autims in Nazi Vienna’। নিশ্বাস বন্ধ করে লেখাটা পড়ছিল রণদীপ। নাৎসি ভাবধারার অন্যতম চিন্তাবিদ গোয়েবল্‌সের বড় ভক্ত ছিলেন ডা. আসপার্গার, তেমনই বলেছেন লেখক।

ডা. আসপার্গার, ইউথানাশিয়া, বাচ্চাদের মেরে ফেলা গোয়েবল্‌স, হাইডেলবার্গ, ডা. লাভলি রায়, রণদীপের হোম, ওসমান, শ্রবণা কোথাও কি একটা সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে?

মাথা ঘুরছে রণদীপের!

প্রথম পাতার পর

রাজার পিসির কুমড়ো দিয়ে খেলা

আমি একটা কাল্পনিক মডেল খাঁড়া করেছি বিষয়টা বুঝতে। ধরা যাক, যেকোনও খেলায় দুটো সমশক্তির দলের যেকোনও একটার জেতা, ড্র বা হারার সম্ভাবনা এক-তৃতীয়াংশ করে। টাই হবে না ধরে নেওয়া হচ্ছে এখানে। আইসিসি-র ক্রম-পর্যায়ে দুটো দলের ক্রম-সংখ্যার পার্থক্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উঁচু র‍্যাঙ্কের দলের জেতার সম্ভাবনা অবশ্যই বাড়বে। ধরে নিচ্ছি, র‍্যাঙ্ক পার্থক্য এক বাড়লে, ভাল দলের জেতার সম্ভাবনা বাড়বে ৬ শতাংশ করে। তাদের হারা বা ড্র-এর সম্ভাবনা কমবে ৩ শতাংশ করে। মডেলটাকে এরকম না ধরে যুক্তিসম্মত অন্য কিছুও ধরা যেতেই পারে। তাতে আমাদের আলোচনার সারবত্তা কিছু বদলাবে না।

প্রথম সমস্যা হল, প্রতিযোগিতায় সকল দলের প্রতিপক্ষ আলাদা আলাদা। যার ফলে, কারও প্রতিপক্ষ কঠিন, কারও বা সহজ, এমন হবেই। যদি রাউন্ড-রবিন লিগ সিস্টেমে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে খেলত, তবে প্রতি দলের ক্ষেত্রে সেই দলের এবং তার আট প্রতিপক্ষের ক্রম-সংখ্যাগুলি হত ১, ২, ৮..., ৯, যার যোগফল হত ৪৫। সবার ক্ষেত্রেই। যেহেতু প্রতি দল দু’টি নির্দিষ্ট দলের বিরুদ্ধে খেলছে না, দরকার ছিল এই দুই না-খেলা প্রতিপক্ষের র‍্যাঙ্কের যোগফল যেন কাছাকাছি হয় সব দলের ক্ষেত্রে। প্রতিযোগিতার নির্ঘন্ট কিন্তু একদমই সেরকম নয়। যেমন, শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে এই দুই না-খেলা প্রতিপক্ষের র‍্যাঙ্কের যোগফল ৬, আর অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে এই যোগফল ১৪। তাই এটা পরিষ্কার যে, শ্রীলঙ্কা খেলছে না দুই কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে, যাদের র‍্যাঙ্ক একেবারে উপরের দিকে। অস্ট্রেলিয়ার না-খেলা প্রতিপক্ষ কিন্তু অনেক এলেবেলে দল।

প্রতিপক্ষের শক্তিতে এই অসামঞ্জস্য যে টুর্নামেন্টের ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে তার একটা উদাহরণ দেখা যাক। টুর্নামেন্টের নির্ঘন্ট অনুসারে ইংল্যান্ড খেলবে না বাংলাদেশ আর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে, যাদের র‍্যাঙ্কের যোগফল ১১। অঙ্ক করে দেখেছি, আমাদের ধরে নেওয়া জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনার মডেল অনুসারে, এর ফলে ইংল্যান্ডের সম্ভাব্য মোট পয়েন্ট হতে পারে ৩৬০। মোট ১২০x৬০=৭২০ সম্ভাব্য পয়েন্টের মধ্যে। যদি, এর পরিবর্তে, ইংল্যান্ড ক্রমতালিকার সবশেষে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর বাংলাদেশের (যাদের র‍্যাঙ্কের যোগফল ১৭) সঙ্গে না খেলত, তবে তাদের সম্ভাব্য পয়েন্ট হতে পারত ৩২৭। আবার যদি ইংল্যান্ড ক্রমতালিকার শীর্ষে থাকা ভারত এবং নিউজিল্যান্ডের (যাদের র‍্যাঙ্কের যোগফল ৩) সঙ্গে না খেলত, তাদের সম্ভাব্য পয়েন্ট হত ৪০৫। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলার একটা অসুবিধা তো আছেই। এবং টুর্নামেন্টে যে প্রতিপক্ষের ব্যাপারে কোনও সামঞ্জস্য নেই, সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রতিযোগিতার নিয়মে কোনও ম্যাচ ড্র হলে, দুই প্রতিপক্ষ দল পাবে সে খেলার নির্দিষ্ট মোট পয়েন্টের এক-তৃতীয়াংশ করে। বাকি এক-তৃতীয়াংশ পয়েন্ট পাবে না কেউই। যেমন কোনও খেলায় ৪০ পয়েন্ট থাকলে, ড্র-এর জন্য দুই দল পাবে ১৩ পয়েন্ট করে (নিকটতম পূর্ণ সংখ্যায়), বাকি পয়েন্ট নষ্ট। এমন নিয়ম অনেক খেলাতেই থাকে। অনেক ফুটবল লিগেই ম্যাচ জিতলে ৩ পয়েন্ট, আর ড্র হলে ১ পয়েন্টের ব্যবস্থা থাকে। তাই ‘দুটো ম্যাচ ড্র করা’র থেকে ‘একটা জেতা আর একটা হারা’ অনেক ভাল পয়েন্টের প্রেক্ষিতে। টুর্নামেন্টে সবাই সবার সঙ্গে খেললে, এ নিয়ে সমস্যার কিছু ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের প্রতিপক্ষের শক্তির মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নেই। বাস্তবে দুই প্রতিপক্ষ দলের শক্তির তারতম্য বেশি না থাকলে, ড্র-এর সম্ভাবনা বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। যার ফলে কমে যাবে পয়েন্ট। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক, টুর্নামেন্টের নির্ঘন্ট অনুসারে ইংল্যান্ড খেলবে না নিউজিল্যান্ড আর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, যাদের ক্রম-সংখ্যার যোগফল ১১। এদের মধ্যে নিউজিল্যান্ড ক্রম-তালিকার উপরের দিকে, আর বাংলাদেশ একেবারে নিচে। ইংল্যান্ড মাঝের সারিতে। তাই ইংল্যান্ডের সঙ্গে দুই দলেরই র‍্যাঙ্কের বেশ খানিকটা পার্থক্য। ফলে ইংল্যান্ডের জেতার সম্ভাবনা বেশি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, আর হারার সম্ভাবনা বেশি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ড্র-এর সম্ভাবনা দু’-ক্ষেত্রেই কম। আমরা আগেই দেখেছি, আমাদের মডেল অনুসারে ইংল্যান্ডের সম্ভাব্য পয়েন্ট ৩৬০। যদি এর পরিবর্তে ইংল্যান্ডের দুই না-খেলা প্রতিপক্ষ হত অস্ট্রেলিয়া আর শ্রীলঙ্কা, সেক্ষেত্রেও না-খেলা প্রতিপক্ষের ক্রম-সংখ্যার যোগফল থাকত ১১-ই। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া আর শ্রীলঙ্কা দুই দলই ক্রম-তালিকায় ইংল্যান্ডের কাছাকাছি হওয়ায় দু’-দলের সঙ্গেই ইংল্যান্ডের ড্র-এর সম্ভাবনা হত বেশি। তাই এদের সঙ্গে না খেললে কিছু পয়েন্ট হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যেত। ইংল্যান্ডের মোট সম্ভাব্য পয়েন্ট হতে পারত ৩৬৩।

টুর্নামেন্টের কাঠামোতে গলদ আরও অনেক। একই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হোম-অ্যান্ড-অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলার সুযোগ নেই। এমনিতে প্রতি দল ৩টি সিরিজ খেলবে নিজের দেশে, ৩টি খেলবে প্রতিপক্ষের দেশে। নিজের দেশের মাটিতে এবং বিদেশে সিরিজ খেলার সংখ্যায় একটা সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ক্রিকেট এমনই একটা খেলা যাতে নিজের মাঠে খেলা এবং টসে জেতা উভয়েরই প্রভূত সুবিধা। বোধকরি তার পরিমাণ অন্যান্য অনেক খেলার থেকেই বেশি। আইসিসি-তেও এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা চলেছে। এমনও আলোচনা হয়েছে যে, সফরকারী দলকে টস জেতার সুবিধাটা দিয়ে দেওয়া হোক— বিদেশের মাটিতে এবং আবহাওয়ায় খেলার প্রতিবন্ধকতার ক্ষতিপূরণ হিসাবে। তাই এই বিশ্ব প্রতিযোগিতাতেও কোনও দল দেশের মাটিতে কোন প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলছে, আর বিদেশে খেলছে কাদের গুহায় গিয়ে, তা অবশ্যই ভীষণ, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রতিপক্ষের র‍্যাঙ্কগুলোর যোগফল আর বিদেশের প্রতিপক্ষের র‍্যাঙ্কগুলোর যোগফল কাছাকাছি হওয়া উচিত ছিল। নিরপেক্ষতার স্বার্থেই। প্রতিযোগিতার নির্ঘন্টে তা নিশ্চিত করা হয়নি, বলাই বাহুল্য। ক্রিকেটে বিদেশের মাটিতে খেলা এতটাই কঠিন যে, বিরাট কোহলি চাইছেন, বিদেশে জয়ের ক্ষেত্রে যেন দ্বিগুণ পয়েন্ট দেওয়া হয়।

আর এক সমস্যা হল, কোনও সিরিজে রয়েছে ২টো ম্যাচ, কোনও সিরিজে ৩, ৪ বা ৫। দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ২ ম্যাচের সিরিজে কোনও ভাল টিম যদি একটা ম্যাচে হেরে যায়, তার ৬০ পয়েন্টের দফারফা। ওদিকে ৫ ম্যাচের সিরিজ হলে এমন ঘটনা একবারের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই অঘটন ঘটলেও তা ২৪ পয়েন্টের উপর দিয়েই যাবে। তাই ম্যাচের সংখ্যা বিভিন্ন হলে, ভেরিয়েবিলিটি বা পরিবর্তনশীলতাও বদলাবে। সব সিরিজের ম্যাচের সংখ্যা সমান হওয়াটাই তাই আদর্শ পরিস্থিতি।

বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপের নির্ঘন্ট আর নিয়মকানুন দেখে অস্ট্রেলীয় কবির কবিতার শিরোনামটাই মনে পড়ে আর একবার। এটাও কি আর একটা ‘ক্রিকেট ক্যাজুয়াল্টি’? ক্রিকেটের আর একটা দুর্ঘটনা? সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে হিসাবে রেখে সহজেই কিন্তু তৈরি করা যেত পয়েন্টের সিস্টেম, যদি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের অঙ্কবিদদের সঙ্গে একটু আলোচনা করা হত আগে থেকে। সব প্রয়োজন মাথায় রেখে একটা ক্রীড়াসূচি বানানো কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। লিনিয়ার প্রোগ্রামিং বা অপটিমাইজেশনের অনেক সফ্‌টওয়্যার এই কাজ করে দিতে পারত এক চুটকিতে। আইসিসি-র আগে থেকে ঠিক করা ক্রীড়াসূচি যে চটকে যেত তাতে, সেটা অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ।

অনেক হিসাবের পরে আমাদের হাতে তাই পড়ে থাকে পেনসিলটাই। ক্রিকেট তার বাণিজ্যিক রমরমা নিয়ে এগিয়ে চলে। চিয়ার লিডারদের চোখ-ধাঁধানো উচ্ছ্বাসের মধ্যে আমাদের কিন্তু কেবল মনে হতে থাকে ক্রিকেট মানে ঝিঁঝিপোকা ছাড়া আর কিস্যু নয়।

(মতামত নিজস্ব)